OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 128 - 136
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিমল করের গল্প : নিসর্গ ও মনোলোকের সমান্তরাল প্রতিভাস

ড. অমিত কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ
Email ID: amittrayy@yahoo.com
0009-0000-2493-6186

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Turbulent Time, Relation, Complexity, Life and Universe, Genre style, Uniqueness.

Abstract
Bimal Kar is a pioneer in the Bengali literary genre of the 1940s and 1950s. In a turbulent time, when the edifice of culture resting on a broken economy was crumbling, the human mind and its various tensions were giving a different dimension to human relationships. Bimal Kar has captured the subtle ruptures of those underlying relationships through the use of vast details of broken words, and has made them deeply consonant with the universe by closely integrating them. Issues like human spirituality, loneliness, love, sexuality, desires, problems and crises, the simplicity of life or multidimensional complexity have become deeply consonant and multifaceted in the well-marked parallel imagery of the universe. In some cases, the universe has indeed created a contrasting reflection of life in opposing imagery. But its scope is very small. But in most cases, the universe has remained engaged in creating parallel reflections of life in Bimal Kar's stories. The storyteller has made the subtle feelings that could not be expressed in words, not even by using the details of words, shine through each aspect of the universe, the context, and the imagery. As a result, a sense of proportion has come into the story, a deeper life message has come behind simple words, a multidimensional art form of the subconscious. The new story-variation that we see in Bimal Kar, which goes beyond language and highlights spirituality or mystery, has been seen in very few storytellers of his time. Bimal Kar's popular stories bear an example of how a very ordinary life-context can become a pervasive story-element in the context of the universe.

Discussion

১

বাংলা সাহিত্যে গল্পকার বিমল কর এক স্বতন্ত্র পথের পথিক। আঙ্গিক ও জীবনভাবনা— উভয়ের নিরিখেই এই স্বাতন্ত্র্য তিনি দাবি করতে পারেন। বিশ শতকের চার ও পাঁচের দশকে এক অস্থির সময়ের প্রেক্ষাপটে গল্পকার বিমল করের আবির্ভাব। যদিও ১৯৪৪-এ তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'অম্বিকানাথের মুক্তি' 'প্রবর্তক পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় তবুও পাঁচের দশক থেকেই তিনি জনপ্রিয় গল্পকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ছেচল্লিশের হিন্দু-মুসলিম ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, সাতচল্লিশের দেশভাগ ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা তাই বিমল করের ছোটগল্পগুলির রচনার পরোক্ষ প্রাণনা হিসেবে কাজ করে থাকবে।

যে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থির বাতাবরণে বিমল করের আবির্ভাব সেই অস্থিরতার রূপায়ণ চোখে পড়ে তাঁর কথা সাহিত্যে। তবে প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে। সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে লেখা তাঁর 'নিগ্রহ', 'সে', 'ওরা' প্রভৃতি গল্পের দিকে তাকালে দেখি গল্পকার অস্থির সমাজ-প্রতিবেশের চিত্রায়ণের উপর ততটা মনোযোগী নন, যতটা মনোযোগী হয়ে উঠেছেন মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে মানব-সম্পর্কগুলোর মধ্যে যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে চলেছে, তাকে চিহ্নিত করায়।

তাঁর অধিকাংশ গল্পে বাইরের এই অস্থিরতা মানসিক অস্থিরতায় রূপান্তরিত হয়েছে। সেকারণে তাঁর গল্পের চরিত্রেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগ, সময়ের স্রোতে ভেসে চলে খড়কুটোর মতো নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে, প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের সামর্থ্যটুকুও যেন নেই। বাইরের জগতে যতই তারা এভাবে কোণঠাসা হতে থাকে মনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ রূপ নেয় প্রবৃত্তিগুলো। তাদের প্ররোচনায় মানুষ ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলো হয়ে ওঠে জটিল, বহুস্তরীয়।

এই বদলে যাওয়া জটিল মানবিক সম্পর্কগুলোকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা ডিটেইল্ ব্যবহারে ধরতে চেয়েছেন গল্পকার। সে কারণে চরিত্রের বহিরঙ্গীয় ঘটনা-বাস্তব থেকে তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন অন্তর্বাস্তবতার দিকে। তাই মনস্তাত্ত্বিকতা এবং বিশ্লেষণ-প্রবণতা তাঁর গল্পের এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। আমাদের অন্তর্গত মন তাঁর গল্পে একটি বড় experiment হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁর 'মোহনা' গল্পের মোহনাকে বলতে শুনি— "আমি ভাই মনটাকে একটা মানুষ বলি—ভেতরের মানুষ। তুই কোনদিন তার গোটা চেহারা দেখতে পাবি না, তাকে ভালো বুঝবি না, অথচ সে তোকে আড়াল থেকে কোথায় চালিয়ে নিয়ে যাবে তুই জানিস না।" 'ছোটগল্প : নতুন রীতি' পত্রিকায় তিনি বলেছেন—

> "আমরা যে অন্তর্মুখী হয়েছি, বহির্ঘটনাময় জীবন থেকে ঘরের নিভৃত কোণে অন্তর ঘটনার বৃত্তে বাঁধা হয়ে গেছি, অনেক বেশি স্পর্শাতুর উদাসী একাকী হয়েছি —একথা অস্বীকার করা যায় না। ... ছোটগল্পেরও হৃদয়গত পরিবর্তনের কারণ আমাদেরই জীবনের পরিবর্তন।"[১]

বিমল করের ছোটগল্পে একারণেই আমাদের মনের অবচেতনার বিসর্পিল গতিকে ফুটে উঠতে দেখি এক অভিনব আঙ্গিকের আধারে। আমাদের 'ভেতরের মানুষে'র কথা বলতে গিয়ে তাঁর গল্পে ভাঙাচোরা শব্দের বিপুল সমাহার দেখি। গল্পকার তাতেও ঠিক স্বস্তি বোধ করেননি। অনুপুঙ্খ ডিটেইল্ ব্যবহারের পরেও তিনি উপনীত হয়েছেন নিসর্গবিশ্বের কাছে। একজন দক্ষ কবির মতোই তিনি নিসর্গের নানা চিত্রকল্পকে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তাঁর গল্পে প্রয়োগ করেছেন আমাদের মনের নিহিত স্বরূপকে তুলে ধরার জন্য। বিমল করের গল্পে একারণেই মনোলোক আর নিসর্গবিশ্বের নিবিড় যোগসূত্রটিকে আমরা খুব সহজেই খুঁজে পাই।

২

'সুধাময়' গল্পে সুধাময়ের পিতাকে একজন প্রকৃতি-তন্নিষ্ঠ অধ্যাত্মস্বভাব-সম্পন্ন মানুষ হিসেবে চিত্রিত হতে দেখি। প্রকৃতিকেই তিনি ঈশ্বর বলে জানতেন। জীবন ও প্রকৃতির নিবিড় যোগকেই তিনি তাঁর দার্শনিক চেতনার গভীরে উপলব্ধি করতেন। তাই সুধাময়ের জন্মাবার পর তার তারস্বরে কান্নার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জ্যোৎস্না-আকুল নদী, চর, বন, আকাশকে দেখিয়ে বলেন— "এরই কোথা থেকে ও এসেছে কিনা— তাই বড় লেগেছে। অত কান্না। ভাবছে বুঝি অত আনন্দ অত সুধা থেকে কেউ ওকে কেড়ে নিয়ে এসেছে। বড় হলে বুঝতে পারবে এ সবের সঙ্গেই সে আছে। তখন আর কাঁদবে না।"

বাস্তবের সমস্যা এইভাবে চরিত্রের অধ্যাত্ম-মানসের পথ বেয়ে নিসর্গলোকের সঙ্গে গভীর একাত্মতা রচনা করে, অনন্ত ব্যাপ্তি পায়। কখনো বা প্রকৃতি হয়ে ওঠে মনোলোকের মৃত্যুচেতনার দ্যোতক— "তখন প্রচন্ড বর্ষা। ... নদীর-দিকে-মুখ-করা লম্বা টানা বারান্দার উত্তর দিকের উত্তর কোনের খানিকটা কেমন করে যেন ধসে গেল। সেই সঙ্গে বাবাও। ঘোলা জলের তোড়ের সঙ্গে ভাসা দেহটা অনেকখানি চলে গিয়েছিল। গিয়ে আটকে ছিল জামরুল গাছের গায়ে।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিশ্বযুদ্ধোত্তর সমাজে মানুষের ক্রমবর্ধমান একাকীত্ব বা নিঃসঙ্গতার বোধ বিমল করের অধিকংশ গল্পের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। 'সুধাময়' গল্পেও তার স্পষ্ট রূপায়ণ আছে। মা মারা যাওয়ার পর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া সুধাময়ের মনের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে গল্পকার নিসর্গের অনবদ্য চিত্রকল্পে ধরেছেন— "কখনো কখনো এ-রকম কোনো বাড়ি চোখে পড়ে—ফাঁকা ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, নির্জন নিস্তব্ধ, গায়ে শ্যাওলা, সুপুরি আর নারকেল গাছের ঝাঁকড়া মাথা অন্ধকারে আড়াল দিয়ে। এমন শূন্য স্তব্ধ একটি বাড়ির নিজস্ব একটি সৌন্দর্য আছে। পুণ্যময়ীর মৃত্যুর পর সুধাময়ের অবস্থাটা ঐরকম দেখাচ্ছিল। ও একা—নিঃসঙ্গ, শান্ত অথচ যেন সমাহিত।"

সুধাময়ের এ নিঃসঙ্গতা ধীরে ধীরে অবশ্য কেটে যায়। কলকাতায় বসবাস কালে একদিন তার ফ্ল্যাটে 'উড়ে এলো এক অপরূপ পাখি'—রাজেশ্বরী। এখানেও প্রেমের চিত্রকল্পে সেই নিসর্গবিশ্ব। এই রাজেশ্বরীর রূপ 'স্ফুলিঙ্গের মতন দীপ্ত, দাহ্য'। এই রূপের দিকে তাকিয়ে সুধাময় বিস্মিত হয়েছে, বিভ্রান্ত হয়েছে। তার বহিরঙ্গীয় রূপে সুধাময়ের প্রেম সফলতা পায়নি। তাই হৈমন্তীর অন্তরঙ্গ রূপের মাঝে সে প্রেমের চরিতার্থতা চেয়েছিল। মিহিরপুর স্যানিটোরিয়ামে হৈমন্তীকে প্রথম দেখার পর তার মনে হয়েছিল ও যেন 'হিম ভেজা ছোট্ট পাখি'। হৈমন্তীর যে শান্ত সমাহিত চরিত্র-অভিজ্ঞান ফুটে উঠেছিল সুধাময়ের মনোলোকে, নিসর্গচিত্রে তারই যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে।

ধীরে ধীরে এই হৈমন্তীকে ঘিরে প্রেমের এক ব্যাকুল বেদনাবোধ পুঞ্জিভূত হয়ে উঠেছে সুধাময়ের মধ্যে। মনের সেই অবস্থার সমান্তরাল প্রতিভাস রচিত হয়েছে অনুপম নিসর্গচিত্রে— "স্যানিটোরিয়ামের বাগানে মোরগফুল ঝুটি নাড়ছিল, মালি জল দিচ্ছিল গাছে, ঘন বাসন্তী রঙের গাঁদার ঝোপে একটা বাতাসের ঘূর্ণি পাক খাচ্ছিল।" এই ঘূর্ণি-যে সুধাময়ের মনের ঘূর্ণি, তা পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না। রাজেশ্বরী পর্বের পর সুধাময় মিহিরপুর স্যানিটোরিয়ামে হতাশ আতুরজনের মনে আশা, ভরসা, বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার মহৎ কর্মে ব্রতী হয়েছিল। মনের সেই আত্মোৎসর্গীকৃত ভাব-অভিক্ষেপকে সুধাময় খুঁজে পেয়েছে নিসর্গের মধ্যে, সূর্যাস্তের রক্তিম বর্ণব্যাপ্তিতে— "গোধূলিতে পাহাড়ছোঁয়া আকাশে সূর্য অস্ত যেত। কী যে রঙ— যেন কোনো অনন্ত পুরুষ প্রতিদিন তার বুক থেকে এক সমুদ্র রক্ত এখানের রক্তহীন পাংশু কাতর রুগীদের বুকে ঢেলে দিয়ে যেত।"

স্যানিটোরিয়ামে যে-হৈমন্তীর সাথে সুধাময়ের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে তার অসুস্থ দুখানি চোখ ছিল ক্লান্ত, বিষণ্ণ, গভীর অথচ কীসের ছায়ায় যেন স্নিগ্ধ। দেহাতীত প্রেমের চিরন্তন বৃত্তে সুধাময় হৈমন্তীকে পেতে চেয়েছিল। মনোলোকের সেই প্রতিচ্ছবি বা আকাঙ্খাকেই সুধাময় প্রত্যক্ষ করে নিসর্গের মধ্যে। বিহঙ্গহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে সুধাময়। সেখানে যেন সমুদ্রের ধূসরতা নেমেছে। সামনে একটি নিঃসঙ্গ ম্লান নক্ষত্র পশ্চিমের আকাশে। এ যেন এক অনন্ত বিচ্ছেদের অথচ কি এক আনন্দের মিলনমুহূর্ত। ও কত দূর, কত অস্পষ্ট, তবু যেমন করে অন্ধকার বাতাসে ঝরে পড়ে তেমনি হৈমন্তী তার নরম দৃষ্টি, ক্লান্ত কালো ভুরু, চুলের গন্ধ নিয়ে সেই নির্জনতার মধ্যে সুধাময়ের সত্তার সঙ্গে যেন মিশে গেছে।

অন্তর্লোক আর নিসর্গপ্রকৃতির অনুরূপ সমান্তরাল প্রতিভাস রচিত হয়েছে 'শীতের মাঠ' গল্পে। আত্মস্মৃতি 'উড়ো খই'-এর একস্থলে বিমল কর জানিয়েছেন— "আমাদের জীবনের প্রতিটি পর্বের এক এক রকম চরিত্র থাকে। এ যেন একটি দিনের মতন। ভোরের ফরসা, সকালের নরম আলো, বেলার দিকের রোদের গাঢ়তা— এক এক রঙ ছড়িয়ে যায়। মধ্যাহ্নবেলার তাত, অপরাহ্নের মরে আসা আলো—তার বর্ণও আলাদা। তবু সব মিলেমিশে একটি দিনের সারাবেলা গড়ে ওঠে। আমাদের জীবনও যেন সেই রকম।" 'শীতের মাঠ' গল্পে নবেন্দুর একটি দিনের যাপনচিত্রে অনুরূপ জীবনবোধকে রূপায়িত হয়ে উঠতে দেখি নিসর্গ আর মনোলোকের পরিপূরকতার সূত্রে। বিমল কর লিখেছিলেন—

> "...এমন একটি ভৌতিক যুগে বাস করছি—যে যুগে সব কিছু টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ছে। বিশ্বাস, নীতি, ধর্ম, কল্যাণবোধ, জীবনে সৌন্দর্যের ধ্যান—কী না!"[২]

আসলে এতদিন যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদের [Basic] উপর দাঁড়িয়েছিল সমাজের আধিসৌধ বা super-structure, সেই অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছিল তার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা আধিসৌধ। সেদিনের সমাজে যেখানে বেঁচে থাকার জৈবিক প্রয়োজনই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, অস্তিত্বের সঙ্কট যেখানে প্রবল আকার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিচ্ছিল, মানুষের প্রতি মানুষের অবিশ্বাস-অনাস্থাও তাই কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বিমল কর মানবিক মূল্যবোধের স্বপক্ষে কলম ধরলেও তাঁর বেশ কিছু গল্পে দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষয়িষ্ণুতা বা অবক্ষয়ের ছবি সচেতন ভাবেই চিত্রিত হয়েছে। 'শীতের মাঠ' অনুরূপ একটি গল্প।

এ গল্পের অসুস্থ নবেন্দু সারাদিন মাঠ মুখে করে বসে থাকে। সকালের দিকে যখন স্ত্রী অতসীকে কিছুটা কাছে পায়, তার সান্নিধ্যটুকু যখন মনের সামান্য তৃপ্তি বা স্বস্তিকে জাগিয়ে তোলে, তখন নবেন্দু জানালার অদূরবর্তী মাঠের মধ্যে দেখে খুব হালকা কুয়াশা, মিহি সাদা রেশমের মতনই। ভারহীন মনের লঘুতা যেন নিসর্গের হালকা মিহি কুয়াশায় রূপায়িত হয়ে ওঠে। নবেন্দু কিন্তু জানে, এ তাদের দাম্পত্য জীবনের স্বাভাবিক ছবি নয়। আরো একটু রোদ বাড়লে মাঠটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন – 'ক'টা পাখি মাঠে বসে, সাঁতার কাটে হাওয়ায়, জঙ্গলের দিকে ডানা মেলে উড়ে যায়।' আসলে সকালবেলায় অতসীর সান্নিধ্যে নবেন্দুর হৃদয়ের ফাঁকা মাঠে যেন অতসী-পাখি ক্ষণিকের জন্য নামে। জীবনের জটিলতা আর ব্যস্ততায় তাকে ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না। তাই সে কেবল হাঁটে আর বাতাসে সাঁতার কাটে। নবেন্দুর বুকের জমাট দীর্ঘশ্বাসে সে বেশিক্ষণ পাখা মেলতে পারে না। রোদ কিছুটা বাড়লে, অফিস যাওয়ার সময় হলে, অতসী-পাখি দূরের জন-অরণ্যের মুক্ত বাতাসের দিকে উড়ে পালায়।

অতসী অফিস যাওয়ার পূর্বে নবেন্দুর প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো একরকম 'দায়সারা' ভাবে মিটিয়ে ফেলে। সারা ঘরময় তখন অফিস যাওয়ার ব্যস্ততা বড় হয়ে দাঁড়ায়। নবেন্দু বিছানায় শুয়ে বুকে পিঠে প্লাস্টার নিয়ে বুঝতে পারে তাদের শুকিয়ে যাওয়া দাম্পত্যের স্বরূপকে। শীতের মাঠের অনবদ্য চিত্রকল্পে ধরা পড়ে সম্পর্কের সেই যান্ত্রিকতাটুকু— "জানলার বাইরে মাঠটা শীতের রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে আছে। ...সারা মাঠে একটি উড়ো পাতা এবার নেচে বেড়াচ্ছে। নবেন্দু পাতাটার রঙ দেখতে পাচ্ছে না। শুকনো খসা পাতা বোধ হয়। পাশের ঘরে অতসীর শব্দ।"

ডাক্তার নবেন্দুকে সিগারেট খেতে বারণ করেছে। একথা মনে করিয়ে দিয়ে নবেন্দুর হাতে একটি টাকা গুঁজেই অতসী অফিসে বেরিয়ে যায়। এই একটি টাকা দুপুরে ভাত খেয়ে একটি এবং বিকেলে চা খেয়ে একটি সিগারেটের জন্য বরাদ্দ। অতসী অফিস বেরিয়ে গেলে অত্যন্ত গ্লানির সঙ্গে, বিতৃষ্ণায় আহত মনে নবেন্দু ভাবতে থাকে ডাক্তার তাকে যে-সমস্ত পুষ্টিকর খাবার খেতে বলেছে কিংবা যা-যা করতে বারণ করেছে সবই কি মেনে চলে অতসী? — "শুধু কি সিগারেট খেতেই বারণ করেছেন আমায় ডাক্তার সেন?... আমি যে নিজের হাতে খাই, কাঠের পুতুলের মতন আধ-পাশ হয়ে ফিরি, আমি যে..."। নবেন্দুর এই চিন্তাসূত্রটি খণ্ডিত হয় মাঠের দৃশ্যপরিবর্তনের ব্যঞ্জনাগর্ভ চিত্রকল্প দিয়ে— "মাঠের বুক দিয়ে মস্ত এক ছায়া হু হু করে ভেসে যাচ্ছিল। রোদ একটু চাপা-চাপা। নবেন্দু ছায়া দেখতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ছায়া কোথায় চলে গেল, নবেন্দু দেখতে পেল না।" স্পষ্টতই বোঝা যায়, এই ছায়া নবেন্দুর মনেরই দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত ছায়া। মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তার আবির্ভাব-লয়ের অনবদ্য ভাষ্য রচনা করেছে নিসর্গপ্রকৃতি।

দুপুরে অতসী অফিসে বেরিয়ে যায়। তখন স্টেশনের পরিমলবাবু ও নন্দীর সঙ্গে অতসীর অন্তরঙ্গতার কথা ভেবে অস্থির হয় নবেন্দু। নবেন্দুর মনোলোকে সম্পর্কের একটি ক্ষয়িষ্ণু ও জটিল রূপ গভীর থেকে গভীর হতে থাকে। ঠিক তখনি মাঠের দিকে তাকায় নবেন্দু। দেখে— "গাছকাটা শুরু হয়ে গেছে। দূর থেকে নিয়মিত ছন্দ রেখে জোড়া কুড়ুলের শব্দ ক্ষীণ হয়ে ভেসে আসছে। নবেন্দু গাছ কাটার শব্দ শুনতে লাগল। অস্পষ্টভাবে দুটি গা-খোলা মানুষের চেহারা মাঠে ভাসছিল।"

গাছকাটার শব্দ যেন নবেন্দু-অতসীর সম্পর্কের ক্রমবিনষ্টির প্রতীকী দ্যোতনা বহন করে। জোড়া কুড়ুল যেন পরিমলবাবু আর নন্দীর প্রতিরূপ। মাঠের মধ্যে গা-খোলা দুটি মানুষের অস্পষ্ট প্রতিরূপে শারীরিক ভাবে অসমর্থ নবেন্দু আসলে এদেরকেই খুঁজে পায়। হলুদ হয়ে আসা রোদে খাঁ-খাঁ করা নিঃসঙ্গ মাঠে তখন হরিয়াল নামে আর গাছ কাটার শব্দ ভেসে আসে। হলুদ হয়ে আসা রোদ দাম্পত্যজীবনের বিবর্ণতা, বিষণ্ণতা, বেদনার প্রতীক হয়ে জীবন-অভিব্যঞ্জনার দায়ত্ব নেয়। গাছ কাটার শব্দ যেন দাম্পত্য সম্পর্কের অনিবার বিনষ্টির ভাষ্য রচনা করে চলে। পরিমলবাবু কিংবা নন্দীর মতো হরিয়াল এসে যেন জীবনের সরস ফলগুলোকে খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সন্ধ্যে নামলে যখন সবপাখি ঘরে ফেরে, সকল অফিসযাত্রী বাড়ি ফিরে আসে, অতসী তখনো ফেরে না। যখন সে বাড়ি ফেরে তখন মাঠের মধ্যে নামে ঘোর অন্ধকার ও শীতের রাত। এ বস্তুতঃ জীবনের সম্মুখ-পরিব্যাপ্ত অনির্দেশ্য অন্ধকার ও জীবনের প্রতি সংরাগ হারিয়ে ভিতরে ভিতরে শীতল হয়ে পড়া দুটি মানুষ কিংবা তাদের সম্পর্কের ভাব-প্রতিরূপ। মাঠের ওদিক থেকে এক বুনো পাখি কান্নার মতো ককিয়ে ককিয়ে ডাকতে থাকে। এ কান্না আসলে শারীরিকভাবে অসমর্থ নবেন্দুর, জীবনের উষ্ণতা পেতে চেয়ে বন্য হয়ে উঠতে চাওয়া হৃদয়ের অসহায় কান্না। সারারাত গাছ কাটার শব্দ হয়— যেন ঘুমহীন রাতে সম্পর্কের ভিতগুলো একে একে ধ্বসে পড়তে থাকে। ঠিক তখনি নবেন্দু ভাবে— "একদিন অবশিষ্ট গাছ কটাও কাটা হয়ে যাবে— তখন নবেন্দু আর বিকেলের জন্য কাঁদবে না। আমি কাঁদব না, অতসী। তোমার অপেক্ষা করব না। মাঠ আমায় নির্বাক নিশ্চল অনড় হতে শিখিয়েছে, মাঠের মতন আমি অন্ধ হব। আমি অন্ধ হয়ে মনে মনে তোমার সিঁথির সিঁদুর দেখব, তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছ।" নিসর্গবিশ্ব আর নবেন্দুর মনোলোক এভাবেই মিলে মিশে গিয়ে জীবনভাষ্যের এক সমান্তরাল প্রতিভাসকে গড়ে তোলে গল্পে।

'হেমন্তের সাপ' গল্পেও নিসর্গ হয়ে উঠেছে নায়ক-নায়িকার জটিল অন্তর্লোকের পরিপূরক। ফুলকুঠিয়ায় হেমলতাদির বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খাওয়ার পর গগন বন্ধু আদিত্যর স্ত্রী ডালিমকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলে ফাঁকা রাস্তায় শীতের রাতে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। পথের মধ্যে রাস্তায় দেখা হয় নিশীথ নামের এক সাইকেল আরোহীর সঙ্গে। তার কাছ থেকে রাত কাটানোর আস্তানার সন্ধান জেনে নিতে গেলে গগন ও ডালিমকে দেখে নিশীথ বার বার হেমন্তের সাপের থেকে সাবধান হবার কথা বলে— "শেষ বেলার সাপ বিষহরিকেও ডরায় না। নিদ্রা যাবার আগে ফণী বিষে জরজর থাকে। ধরণীর ভিতরে বিষ রাখা যায় না গো, উপরে ফেলে দিয়ে যেতে হয়। শাস্ত্রে বলেছে।"

এরপর গল্পে চল্লিশোর্ধ দুই নরনারী বিবাহিত জীবনের চূড়ান্ত নিঃসঙ্গতার জায়গা থেকে পরস্পরের প্রতি সর্পিল কামনাকে মেলে ধরে। বয়সকালে সম্পর্কের শীতঘুমে যাবার পূর্বে হেমন্তের সাপের মতোই জীবনের নিঃসঙ্গতার বিষকে উগরে দিয়ে অবৈধ মিলনে তৃপ্ত হতে চায় তারা। সাপের ভয়ে শীতের রাতে গাড়ির মধ্যে পাশাপাশি বসে থাকে ডালিম ও গগন। মনোলোকে ডানা মেলতে থাকে নিঃসঙ্গ জীবনের বিসর্পিল কামনা। তারই প্রতিরূপকে গল্পকার অত্যন্ত সচেতনভাবে গেঁথে তোলেন নিসর্গের সমান্তরাল প্রতিভাস রচনার মধ্য দিয়ে— "ঝোপের গা থেকে জোনাকির দল যেন ফোয়ারার মতন ছিটকে উঠে মাঠের বাতাসে উড়তে লাগল। নাচতে নাচতে আমাদের গাড়ির সামনের কাঁচে এল, ডালিমের জানলার গায়ে পাক খেতে লাগলো।"

জোনাকি এখানে যৌনতার সচেতন রূপকল্প— যা ডালিমের মনের মধ্যে বিসর্পিল রূপ নিয়ে পাখা মেলছিল। এর সংস্পর্শে থেকে ভিজে উঠছিল গগনের শরীর ও মন। জ্যোৎস্নার আলো আর কুয়াশার পরস্পর লিপ্ত হবার চিত্রকল্পে গল্পকার গড়ে তোলেন নিসর্গ আর মনোলোকের পরিপূরকতার প্রতিভাস। শীতের রাতে গগন গাড়ির কাঁচ তুলে দিতে দিতে তাই লক্ষ করে— "জ্যোৎস্নার সব আলো কুয়াশার গায়ে মাখামাখি হয়ে আছে। যেন নরম নিঃশব্দ বৃষ্টির মতন কুয়াশা সমস্ত কিছুকে ভিজিয়ে দিচ্ছে।"

গগন ভিজে উঠছিল বলেই ডালিমের সাহস অতটা বেড়ে যায়— "ডালিম আমার হাত ধরল নরম করে, ধরে থাকল, তারপর কখন হাতটা টেনে তার মুখের কাছে নিয়ে গেল, চেপে ধরল আঙুলগুলো। ডালিমের মুখের মাংসগুলো কাঁপছিল। ওর গাল যেন ঠান্ডা, ভিজে ভিজে।" গগন কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল। তাই ডালিমের আহবানে সাড়া দিতে পারেনি। সেকারণে ডালিম গগনের হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু হেমন্তের সাপকে শীতঘুমে যাবার আগে তো বিষ উগরে দিতেই হবে। তাই কথক গগনের স্বীকারোক্তি— "ডালিমের হাত আমার কোলের উপর পড়েছিল। আস্তে করে উঠিয়ে নিলাম। গাড়ির কাঁচে একরাশ জোনাকি।" এখানেও জোনাকি স্পষ্টতই যৌনতার প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত। চল্লিশোর্ধ নারীপুরুষ এভাবেই হেমন্তের সাপের মতোই শীতঘুমে যাবার আগে নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনের বিষ উগরে দিতে চেয়েছে। সাইকেল আরোহী নিশীথের চোখে যা গোপন থাকেনি। তাই গল্পের শেষে গগন নিজেও বলেছে— "ডালিম! লোকটার নাম নিশীথ। দিবা হলেও হতে পারতো। এই দিন, এই রাত্রি, এই যে ষড় ঋতু— এদের কাছ থেকে তুমি আমি আমরা যে কিছুই লুকোতে পারি না।"

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মনোলোক আর নিসর্গ বিশ্বের সমান্তরাল প্রতিভাস রয়েছে 'জোনাকি' গল্পেও। গল্প-কথক পরিমলের বন্ধু স্যামুএল এক অর্থে প্রতিবাদী চরিত্র। পড়াশোনায় সেভাবে মনোযোগ দিতে পারে না, কিন্তু কলেজে এস. ডি. ও.র মেয়ে অরুণা হালদারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে সে ছেলেদের তরফে নেতৃত্ব করে। এতে পরিস্থিতি যখন জটিল হয়ে রাজনৈতিক আদল পেয়ে যায় তখন অরুণা হালদার স্যামুএল এর কাছে এসে নিজের ভুল স্বীকার করে এবং প্রকাশ্য সভায় ক্ষমা চাইতেও রাজি হয়। কিন্তু স্যামুএল এর হস্তক্ষেপে অবশেষে দুই তরফ থেকেই ভুল স্বীকার করে বিবাদটি মিটিয়ে ফেলা হয়।

এর কিছুদিন পর থেকে রটে যায় স্যামুএল নাকি অরুণা হালদারের সঙ্গেই প্রেম করছে। রুমমেট পরিমল এ বিষয়ে জানতে উৎসুক হয়। প্রত্যুত্তরে স্যামুএল শুধু হাসে। অবশেষে পরিমলের পরীক্ষা শেষ হলে স্যামুএল তাকে নিয়ে একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত হয় চন্দনঝিলের ভাঙা মানমন্দিরে। পরিমল ভেবেছিল, সেখানে হয়তো অরুণা স্যামুএল-এর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু অন্ধকারে ধ্বসা সিঁড়ি বেয়ে মানমন্দিরের ছাদে উঠে স্যামুএল জোনাকি-জ্বলা ঝিলের অপর পাড়ে হোস্টেল সুপারিটেন্ডেন্ট অমিয় দাস আর অরুণা হালদারকে দেখিয়ে বলে— " 'ওরা আসে, ওরা পাশাপাশি বসে। হেঁটে বেড়ায়, গল্প করে, জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে হাত ধরা-ধরি করে। অরুণা কখনও গান গায়'।"

কিন্তু স্যামুএল তাহলে এই ভাঙা মানমন্দিরে কেন আসে— সেকথা পরিমল জানতে চাইলে স্যামুএল বলে— "দেখি বসে বসে। বাঁশি বাজাই খুব আস্তে আস্তে— এত ধীরে, যেন মনে হয়, ঝিলের ওপার থেকে কেউ বাজাচ্ছে। সেই সুর এখানে ওদের কানে এসে পৌঁছায়—বেশ ভালোই লাগে বোধ হয়।" কথক পরিমল স্যামুএল এর হাত থেকে বাঁশিটি কেড়ে নিয়ে জানতে চায়— "ওরা প্রেম করছে করুক। তাতে তোর কি? তুই কেন বাঁশি বাজাবি?" এর প্রত্যুত্তরে স্যামুএল যা জানায় তা কথককে হতচকিত করে তোলে—"তার বেশি কিছু আমার করার ক্ষমতা নেই, পরিমল! বিয়াল্লিশ বছরের অমিয় দাসকে অরুণার ভালো নাও লাগতে পারে! কিন্তু চন্দনঝিলের মধ্যে অমন জোনাকি-জ্বলা অন্ধকারে বাঁশির সুর শুনতে শুনতে বিয়াল্লিশ বছর কি বিয়াল্লিশই থাকে! কখনই নয়, আমার মাও বত্রিশ বছরের অমিয় দাসকে দেখে ভুলেছিল। অরুণাও ভুলুক—ভুলুক।"

বিমল করের অন্যান্য গল্পের মতো জোনাকি এখানেও প্রেম ও যৌনতার প্রতিরূপ হয়ে এসেছে। পরিব্যাপ্ত বাঁশির সুর একদিকে যেমন প্রেমের অনুকূল প্রতিবেশকে জাগিয়ে তুলেছে তেমনি একইভাবে প্রেমহীনতার যন্ত্রণাকেও তীব্র থেকে তীব্র করে তুলেছে। স্যামুএল-এর মুখটা অন্ধকারে হারিয়ে যাবার পর কথক পরিমলের তাই মনে হয়েছে— "হঠাৎ কানে এল বাঁশির সুর। মানমন্দিরের ভূগর্ভের কক্ষ থেকে যেন রন্ধ্রপথে একটি বেদনার্ত নিশ্বাস ভেসে এসে গুমরে গুমরে ছড়িয়ে পড়ছে। বাতাসে কাঁপছে সেই আশ্চর্য সুর। চন্দনঝিলের কাল প্রচ্ছদপটে অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। ফুটকি ফুটকি লালচে আলোয় অদ্ভুত এক পৃথিবী জেগে উঠেছে। যে পৃথিবীতে অমিয় দাস আর অরুণা হালদার হাতে হাত ছুঁয়ে বসে থাকে; স্যামুএল শুধু জ্বলে আমারই চোখের সামনে— আশ্চর্য এক জোনাকির মতন।" অনবদ্য চিত্রকল্পের সঙ্গে এখানে ভাষায় এসেছে আবেগের কাব্যিক ছোঁয়া। কবিতার তান ও লয় যেন গদ্যের গতিকে আশ্চর্ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। গদ্যের এই আবেগময়তা অরুণা হালদারের প্রতি স্যামুএল-এর ভালোবাসার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে গাঢ়তর করে তুলেছে।

এখানেও নিসর্গ হয়ে উঠেছে স্যামুএল-এর মনোরূপের পূর্ণ প্রতিবিম্ব। জোনাকির আলোর জ্বলা-নেভার মতোই স্যামুএল-এর অসহায় প্রেম যেন রাতের অন্ধকারের মতো অতল যন্ত্রণার গভীরে জ্বলে আর নেভে— আশায় জ্বলে আর নিরাশায় নেভে। জোনাকির মতো অন্যের প্রেমে আলোময় উদ্দীপন বিভাব হয়েও নিজে ডুবে থাকে প্রেমহীনতার আলোহীন গাঢ় অন্ধকারে। গল্পের সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা নিয়ন্ত্রণকারী স্যামুএল এভাবেই গল্পে জোনাকির ভাব-অবিব্যঞ্জনায় পরিভাষিত হয়ে গল্প-নামকেও সার্থক করে তোলে।

'পলাশ' গল্পের শুরুতেই রয়েছে নিসর্গের মায়াবী বর্ণনা— "ওখানে পলাশ ফুটেছে। ফাল্গুনের এই গোড়াতেই গাছগুলোর গা-মাথা লাল টুকটুক করছে। সকালের রোদে— শুধু সকাল কেন, একটু চড়া বেলার রোদে—দুপুরে, শেষ বিকেলেও যে কী সুন্দর দেখায়! তাকালে চোখ ফেরানো যায় না। তবু তো ওখানটা পলাশ বন নয়; মাঠের মধ্যে এদিক-

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ওদিক দু'-দশটা গাছ, এই যা।" ধান কাটার পর ফাঁকা ক্ষেত। আঁকাবাঁকা বিস্তৃত আলপথ। তারই মধ্যে কোথাও বা আমলকি, হরিতকি, জাম-জামরুলের গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ফাগুন দিনে এমনি এক সাধারণ, সুন্দর জায়গায় শ্যালিকা উমাকে নিয়ে বেড়াতে আসে গল্পের নায়ক রতিকান্ত। ট্রলিতে চেপে বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরের এই ফাঁকা মাঠে পৌঁছে যায়। এক মন-উদাস-করা নির্জন মায়াবী পরিবেশ। মাঝে মাঝে পলাশ ফুটে আছে। "আকাশটা যেন তার গা থেকে সমস্ত রোদের ঢেউ এই মাঠ আর ক্ষেত আর নিরিবিলি ফাঁকায় ছড়িয়ে দিয়েছে। অকৃপণ ভাবে। ফাল্গুনের হাওয়া। একটু তবু তপ্ত। কতকগুলো ফড়িং সামনের ঘাসে উড়ে উড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। দু-একটা পাখি সামনে দূরে ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে, আবার এসে বসছে আশেপাশে।" এমন অনুকূল নিসর্গ প্রতিবেশ উমা ও রতিকান্তের মনের মধ্যেও রঙ ছড়ায়। ট্রলি থেকে নেমে পার্শ্ববর্তী গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে উমা ও রতিকান্ত দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে গড়ে উঠেছে যে পলাশকুঞ্জ, তারই কোন একটিতে সময় অতিবাহনের জন্য পা বাড়ায়।

ফাল্গুনের এই নিসর্গ প্রতিবেশে তারা অনেক কিছু ভুলে গেল। শাঁখারিটোলার অন্ধ গলির মেয়ে বাইশ বছরের উমা ভুলে গেল যে "জুতো হাতে ঝুলিয়ে আল দিয়ে খালি পায়ে ছোটা দৃষ্টিকটু; ভুলে গেল যে, হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে বলে চোরকাঁটার ভয়ে গোড়ালির অনেক উঁচু পর্যন্ত কাপড় তুলে নেওয়া অসভ্যতা। শাড়ির তলায় অনেকটা শায়া যে বেরিয়ে রয়েছে পায়ের কাছে এটা অভব্যতা এবং হোক রতিকান্ত জামাইবাবু, তবু যখন তখন তার হাত ধরে টানা— উঠতে পড়তে তাকে জড়িয়ে ধরা, তার সঙ্গে অজস্র কথা বলা এবং ওর সঙ্গে অট্টরোল সারাক্ষণ হাসাহাসিটা উচিত নয়।" অনুকূল নিসর্গ-প্রতিবেশ পঁয়ত্রিশ বছরের রতিকান্তকেও ভুলিয়ে দিয়েছিল অনেককিছুই। "বিনুর স্বামী হিসেবে তার যেসব কর্তব্য, সেই কর্তব্যগুলো কি বজায় থাকছিল এখানে— এই রোদভরা মাঠে আর ফাঁকায় আর ফাল্গুনের হঠাৎ মধুর দুপুরে বোধ হয় থাকছিল না। উমার ফরসা রোদের ঝাঁঝলাগা মুখখানা এত মুগ্ধ হয়ে তবে কেন সে দেখবে? মাথার উপরকার তাতটুকু বাঁচাবার জন্যে, উমা আলগা করে যে ঘোমটাটুকু তুলে দিয়েছিল, সেই ঘোমটাটুকু বা রতিকান্তর এত ভাল লাগবে কেন?কেন মনে হবে তার পাশে-পাশে মাথায় কাপড় তুলে দেওয়া যে মেয়েটি চলেছে এর সঙ্গে বিনুকে অনায়াসেই কল্পনা করা যায়।"

মাঠের মধ্যে ওরা টকটকে লাল পলাশ ফুল পাড়লো, রতিকান্ত উমার এলোচুলে লাল পলাশের ফুল গুঁজে দিল। রতিকান্ত উমার 'ঘামের বিন্দুতোলা মুখ-গলা দেখল',রোদের তাতে লাল হয়ে ওঠা গায়ের রঙ দেখলো, টলটলে সুন্দর দুখানা চোখ দেখলো, আলতা-লাল ব্লাউজটাকে জ্বলজ্বল করে উঠতে দেখলো। পুকুরের পাড়ে ছায়াঘন কুঞ্জে বসে টিফিন ও চা খেল। উমা গান গাইলো। তারপর দুপুর-গড়ানো আলোয় নির্জন পুকুর পাড়ে বসে রইল তারা। "চুপচাপ দুটি মানুষ। কেউ কারোর দিকে চাইছে না। তবু দুজনেই অনুভব করতে পারছে, এখন একের মনে অন্যজন এই নিস্তব্ধ পরিবেশটির মতন ছড়ান, মাখান।" নিসর্গ এখানে দুটি নরনারীর মনোলোকের সুস্পষ্ট প্রতিভাস রচনা করেছে। বলা চলে, ভালোবাসার ভাষারূপ নির্মাণ করেছে।

উমা কিন্তু জানে, কলকাতা ফিরে গেলে রতিকান্তের এই 'দুখানা' মন আবার জুড়ে গিয়ে 'একখানা' হবে। রতিকান্তও জানে স্ত্রী বিনুকে উপেক্ষা করে উমার অতটা কাছে সে পৌঁছতে পারবে না। তাই রতিকান্তের সব সময় হাসিমাখানো যে চোখ তাতে ক্রমে ফুটে ওঠে 'ভীষণ এক অন্যমনস্কতা এবং বিষণ্ণতা'। উমার ঠোঁটে ততক্ষণে পানের লাল দাগও শুকিয়ে গেছে। 'চোখের তারার তলায় তেমনি একটা শুষ্কতা'। মনের গভীরে জেগে ওঠা ইচ্ছেগুলো জেগে উঠেই বাস্তবের কঠিন আঘাতে যেন মৃত্যুমুখে পতিত হল। মৃত্যুর সেই বিষণ্ণতা, তাদের মনোলোকের সেই বিশেষ অবস্থাকে গল্পকার প্রকাশ করেছেন নিসর্গের অনবদ্য চিত্রকল্পে— "গান থামল। ছায়া যেন আরো বিষণ্ণ হল এখানে। একটা দমকা হাওয়া এলো। গাছ-পাতা নড়ল। হাওয়ার শব্দটা অবুঝ দীর্ঘনিশ্বাসের মতন খানিকক্ষণ ছটপট করে মিলিয়ে গেল।" বিকেলের ম্লান আলো মেখে তারা বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

ট্রলিতে করে বাড়ি ফেরার পথে রতিকান্তের মনের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। মনে প্রশ্ন জাগে 'এতকাল— চারটে বছর বিনু কি ঝুটো ছিল?' নারী কিংবা স্ত্রী হিসেবে বিনুকে বিচার করে দেখলো রতিকান্ত। কিন্তু কোন খামতি খুঁজে পেল না। নিজের স্ত্রী-কন্যা-সংসারকে নিয়ে সুখী থাকার কথা ভাবলো সে। কিন্তু জ্যোৎস্নামাখা রাতে বসন্তের হাওয়ায় বাড়ি ফেরার পথে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জ্যোৎস্নায় ডুবে থাকা গাছ-গাছালির দিকে মুগ্ধ চোখে তাকানো উমাকে দেখে রতিকান্তের মনে হল - "উমাকে তার ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। একটা পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষ বাইশ বছরের এক মেয়েকে যেমন করে ভালবাসতে চায়, তেমনভাবে।" জ্যোৎস্নামাখা নিসর্গ প্রতিবেশে তাই তার মনে হল— "এইভাবে যদি ট্রলিটা রাতের পর রাত জ্যোৎস্না-ডোবা মাঠ-ঘাটের মধ্যে লাইন দিয়ে ছুটে যায়— রতিকান্তের ইচ্ছে হবে না, ও থামুক; রাত শেষ হোক।" কল্পনার এই জগত থেকে একসময় নেমে আসে রতিকান্ত। কিন্তু হৃদয়ের একাগ্র ইচ্ছায় উমাকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে ক্ষণমুহূর্তের অনুভবের মাঝে সে প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে ঠিক করে।

কিন্তু নিজের স্ত্রী, মেয়েকে ভালোবাসার পর উমাকে কীভাবে ভালোবাসা সম্ভব, তা ভেবে পায় না রতিকান্ত। সেই স্বাধীনতাও তার আর নেই। তার ইচ্ছে করে ত্রিশের আগে প্রাক-বিবাহ পর্বে ফিরে যেতে। তাতে সে যেকোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারবে, ভালোবাসার স্বাধীনতা ফিরে পাবে। কিন্তু স্টেশনের কাছাকাছি ট্রলি পৌঁছে গেলে তার এই ভাবনার ঢেউ ধাক্কা খায়। অথচ নিজের মনের কাছে মুখ রেখে নিজেই বলে— "আমাদের এ-ভালবাসা, এই ভালবাসার ইচ্ছাটা একটা গুণ। আমাকে আমাদের এই ভালবাসাকে সংখ্যায় বেঁধে ফেলতে বলছ। বেশ তো বাঁধছি। আমার স্ত্রীকেই আমি ভালবাসব; শুধু একটি মেয়েকে। কিন্তু ভালবাসতে ইচ্ছে করছে উমাকে— এই ইচ্ছেকে তুমি নষ্ট করে দিতে চাও। পারবে? পারবে না।"

রতিকান্তর মনের এই ভাবনাই গল্পের সমাপ্তিতে অনবদ্য বাঙ্ময় রূপ লাভ করে নিসর্গচিত্রের অনুপম প্রয়োগে। স্টেশনে নেমে উমা তার আঁচলে রাখা পলাশ ফুলগুলি নেওয়ার কথা রতিকান্তকে বললে - "রতিকান্ত থমকে চেয়ে থাকল একটু। টকটকে রোদে পলাশগুলো কত লাল ছিল, আর এখন চাঁদের এমন আলোতেও যেন সেই লাল মরে ক্ষয়ে কেমন পাংশু রঙের হয়ে গেছে।" উমাকে জানায়— 'ওগুলো এখন আমার হাতেই ভাল মানাবে।' পলাশের লাল রঙ মরে ক্ষয়ে পাংশু হয়ে ওঠা যেন রতিকান্তের সারাদিনের ইচ্ছেগুলোর হত্যারই প্রতীকী দ্যোতনা বহন করে। কিন্তু ইচ্ছেটার গুণগত মূল্যকে রতিকান্ত স্বীকার করে বলেই উমা রতিকান্তের কথার প্রত্যুত্তরে জানায়— "ছি ও-কথা বলবেন না। বলতে নেই।" উমার চোখের সুন্দর হাসিটাই যেন দাম্পত্য সম্পর্কের বাইরে প্রেমকে স্বতন্ত্র এক মূল্যমানতায় প্রতিষ্ঠা দেয়।

'আমরা তিন প্রেমিক ও ভুবন' গল্পেও দেখি শিবানীকে হারিয়ে শিবানীর তিন প্রেমিক কমলেন্দু, অনাদি, শিশিরের তুলনায় গভীরতর শোকের মধ্যে নিমজ্জিত হয় ভুবন। কারণ শিবানীকে বিয়ে করে ভুবন এমন কিছু পেয়েছিল শিবানীর কাছ থেকে, যা বাকি তিন প্রেমিক পায়নি। অপর তিন প্রেমিক শিবানীর 'নিষ্পাপতা, কৌমার্য, নির্ভরতা'কে হরণ করেছিল, কিন্তু ভুবন শিবানীকে যথার্থ অর্থে ভালোবেসেছিল, ভালোবাসা পেয়েছিল। তাই শিবানীকে দাহ করার পর তার অন্তরের সীমাহীন বিষণ্ণতাকে নিসর্গের সমান্তরাল প্রতিভাস রচনার দ্বারাই স্পষ্ট করে তুলেছেন গল্পকার। ভুবনের অন্তর্গত বিষণ্ণতার নিসর্গব্যাপ্তির মধ্যে অপর তিন প্রেমিকও ভুবনের অন্তর্লোকের পরিচয়কে নতুনভাবে খুঁজে পায়— "চাঁদের আলোয় ভুবনকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল। তার চার পাশে নিবিড় ও নীলাভ, স্তব্ধ, মগ্ন যে চরাচর তা ক্রমশই যেন ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হয়ে এক অলৌকিক বিষণ্ণ ভুবন সৃষ্টি করছিল। এ যেন আমাদের ভুবন নয়। অথচ আমাদেরই ভুবন।"

বিমল করের একাধিক ছোটগল্প এভাবেই হয়ে উঠেছে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের অনবদ্য শিল্পরূপ। তাঁর গল্পে অনুপুঙ্খ বর্ণনা বা ডিটেইল্-এর ব্যবহার থাকলেও আপাত সাদামাঠা গল্পের ভাঁজে ভাঁজে রয়েছে নিখুঁত শিল্পের বুনন। গল্পকারের এই শিল্পসচেতনতা বা পরিমিতিবোধই বিষয়ের ব্যাপ্তি নির্মাণ করেছে জীবন ও নিসর্গের সমান্তরাল প্রতিভাস রচনার মধ্য দিয়ে। অনুচ্চকিত ভাষায় নিরাসক্ত ভঙ্গিতে যেমন তিনি গল্প বলেছেন,গল্পের শরীর নির্মাণ করেছেন, তেমনি নিসর্গ-অনুষঙ্গে তাঁর গল্পের ভাষায় এসেছে চিত্ররূপময়তা, বহুমাত্রিকতা ও কাব্যগুণ। অনেক না-বলা কথাকে কবিতার মতোই ব্যঞ্জনাগর্ভ করে তুলেছেন তিনি।

তাঁর গল্পে নিসর্গ কখনো-বা জীবনের ভাষ্য রচনায় বিপ্রতীপ ভূমিকা নিয়েছে, কখনো-বা জীবনের সমান্তরাল প্রতিভাস রচনা করেছে। তবে বিমল করের গল্পে নিসর্গকে জীবনের বিপ্রতীপ ভাষ্য রচনায় ক্বচিৎ ব্যবহৃত হতে দেখি। তুলনায় নিসর্গ ও জীবনের সমান্তরাল ভাষ্যই তাঁর অধিকাংশ গল্পের সবিশেষ আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের জটিলতা, সংশয়-সংকটকে অনুরূপ শিল্পাঙ্গিকে মুড়ে নিজস্ব উপলব্ধির গভীরে বড় মায়াময় রূপ দিয়েছেন গল্পকার। কিন্তু—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 18
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 128 - 136
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "দুঃখের যে, বৃহত্তর পাঠকসমাজ বিমল করের আপাত সাদামাঠা গল্পের ভুবনে ডুব দেওয়ার ধৈর্য দেখাননি।"[৩]

নির্মোহ ভাবে লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে জীবনের যে আশ্চর্য মায়াময় বাস্তবতা সংশয় ও দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে পরিমিতিবোধ ও অনুপুঙ্খতার আশ্চর্য নির্মাণ ঘটিয়েছেন, তা কখনোই সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। আধুনিক জীবনের গহন জটিলতা আর তার রূপায়ণের স্বতন্ত্র এই শিল্প-আঙ্গিক যে আগামী দিনের সন্ধিৎসু পাঠককে তাঁর গল্পের দিকে আরো গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে।

Reference:

১. উদ্ধৃতি সংগ্রহ, সন্দীপ দত্ত, বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ১৪০০, পৃ. ১৬
২. কর, বিমল, মৃত্যু-ইচ্ছা, সাপ্তাহিক 'দেশ', ৪ঠা জুন, ১৯৫৫, পৃ. ৪৫
৩. ঝা, উৎপল, বিমল করের ছোটগল্প : পরিমিতিবোধ ও অনুপুঙ্খতার আশ্চর্য নির্মাণ, ফিরে দেখা : ছোটগল্প, সম্পাদনা জ্যোতির্ময় দাস, অসীমকুমার বসু পত্রলেখা, ১৪১৬, পৃ. ২৮৮